সংবাদ

তারিখ ... JUN 06 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪ ...

কুষ্টিয়ায় যা ঘটছে

জাল সার্টিফিকেট দিয়ে প্রভাষকের চাকরি তাতেই 'অধ্যাপক' এমপি শহীদুল

রুকুনউদ্দৌলাহ ও মঈনুল হক, কুষ্টিয়া থেকে ফিরে

হত্যা, সন্ত্রাস, জালিয়াতি ও টেন্ডারবাজির পাশাপাশি জাল-জালিয়াতিতেও সিদ্ধহস্ত এমপি শহীদুল ইসলাম। ব্যক্তিগত জীবনে অসততার পাঠ শুরুই হয়েছে তার জালিয়াতির মধ্য দিয়ে। সেই জালিয়াতির ফসল হিসেবে তার নামের আগে যুক্ত হয়েছে 'অধ্যাপক' শব্দটি। একইভাবে এমপির প্রভাবের কারণে তার ছোটভাই ভেড়ামারা পৌরসভার চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম আলম যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এপিপি পদ দখল করে বসে আছে।

ভেড়ামারার সর্বজন স্বীকৃত ভুয়া অধ্যাপক এমপি শহীদুল ইসলাম। তার ভাইয়ের এপিপি পদ নিয়েও রয়েছে নানা কথা। শহীদুল ইসলাম মালিথা যেমন মিথ্যা তথ্য ও জাল সার্টিফিকেট দিয়ে প্রভাষক হয়েছিলেন তেমনি ভাই আলম মালিথাও নাকি কোন অভিজ্ঞতা-যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রভাব খাটিয়ে এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) হয়েছেন। এপদের জন্য আইন বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করার পর যে নির্দিষ্ট

নেই। তার সব যোগ্যতা-দক্ষতার মাপকাঠি হচ্ছে বড়ভাই এমপি শহীদুল ইসলাম মালিথা।

১৯৮১ সালে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা কলেজে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষকের চাকরি পান শহীদুল ইসলাম। ১৯৮৬ সালে সেই চাকরি ছেড়ে চলে আসেন তিনি। মাত্র ৫ বছরের মধ্যে এমনকি ঘটেছিল যে কোন ধরনের উচ্চবাচ্য না করেই চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন! অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে শিহরিত হওয়ার মতো কাহিনী। ১৯৮১ সালের ১০ আগস্ট ভেড়ামারা কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক পদের জন্য আবেদন করেন শহীদুল ইসলাম। তৎকালীন সাপ্তাহিক মুকুর পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তিনি কলেজে আবেদন করেন। নিজ হাতে লেখা দরখাস্তে তিনি তার শিক্ষাগত যোগ্যতার যে বিবরণ দেন তা হচ্ছে, ১৯৬৭ সালে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পাস, ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বোর্ডের অধীনে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি অনার্স পাস ১৯৭২ সালে এবং এমএসসি পাস ১৯৭৩ সালে। এই যোগ্যতার ভিত্তিতে ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে তিনি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। কুষ্টিয়ার তৎকালীন জেলা প্রশাসক ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আবদুল মান্নান ভূঁইয়াসহ ৪ সদস্যের নিয়োগ বোর্ড সর্বসম্মতির ভিত্তিতে শহীদুল ইসলামকে

চাকরি : জাল সার্টিফিকেট দিয়ে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

মনোনীত করেন।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। প্রভাষক পদে চাকরির ৫ বছরের মাথায় যেন হঠাৎ করে ঝড় ওঠে। সব গোমর ফাঁস করে দেয় একই কলেজে চাকরিরত শহীদুল ইসলামেরই এক বন্ধু। ওই শিক্ষক সরাসরি জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেন, শহীদুল ইসলামের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ মিথ্যা এবং কলেজে যে কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে তা ভুয়া। এ সময় কলেজের একজন শিক্ষক লুৎফর রহমান বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করেন। আবেদন পাওয়ার পর তৎকালীন জেলা প্রশাসক কলেজে আসেন এবং জরুরি বৈঠক করেন। সভায় তিনি শহীদুল ইসলামের ফাইল ক্লোজ করে নিয়ে যান এবং এক সপ্তাহের মধ্যে মূল সার্টিফিকেট নিয়ে তার দপ্তরে হাজির হওয়ার জন্য শহীদুল ইসলামকে লিখিত নির্দেশ দেন। এরপর থেকে শহীদুল ইসলাম আর কলেজে আসেননি এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ নিয়ে উপস্থিতও হননি।

স্থানীয় একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, প্রভাষক পদের আবেদনে শহীদুল ইসলাম প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস বলে দাবি করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ২য় বিভাগে পাস। ১৯৬৯ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বগুড়ার আযিযুল হক কলেজ থেকে তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষায় তার রোল নম্বর ছিল ৩৫৭৬। রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড তাকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছে তার নম্বর ৪১৫৫৬। সার্টিফিকেট জালিয়াতি করে অবৈধভাবে কলেজে চাকরি নেয়ার ঘটনায় সে সময় জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা অধিদপ্তর পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, শুধু প্রভাষক পদে চাকরির জন্য নয়, শহীদুল ইসলামের এই জালিয়াতি শুরু হয়েছে আরও আগে থেকে। যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যান তখন স্কোর কম হওয়ায় তিনি এই সার্টিফিকেট জালিয়াতির ঘটনা ঘটান। এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগকে প্রথম বিভাগ দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ও এমএ পাস করেন এমপি শহীদুল ইসলাম। জালিয়াতির ঘটনা জানাজানির পর এলাকায় এ নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। এরপর শহীদুল ইসলাম আরও বেশি করে মনোযোগ দেন বিএনপি দলীয় রাজনীতিতে। বিষয়টি বহুদিন ধরে আলোচিত হলেও শেষ পর্যন্ত তার ক্ষমতার কারণে চাপা পড়ে যায়। কারণ ততদিনে তিনি এমপি পদ দখলের মধ্যদিয়ে জাল সার্টিফিকেটে হওয়া প্রভাষক পদকে অধ্যাপকে উন্নীত করেন।

এদিকে এমপি শহীদুল ইসলামের ভাই আলমের এপিপি হওয়া নিয়ে এলাকায় রয়েছে নানা কথা। অনেকেই অভিযোগ করে বলেছেন, নিয়মানুযায়ী এপিপি হতে হলে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সেই অভিজ্ঞতা আলমের নেই। আইন পাস করার পর তো দূরের কথা এপিপি হওয়ার পর একদিনের জন্যও তাকে আদালতে যেতে দেখা যায়নি। সন্ত্রাসী বাহিনীর প্রধান ও সব বেআইনি কাজের হোতা তৌহিদুল ইসলাম আলম আইনি এ গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করতে পেরেছেন তার ভাই এমপি শহীদুলের জোরে।